# কোয়েটা

শুজা রশীদ

নতুন বাসায় যাবার মুহুর্তের মধ্যেই আমি সেটার প্রেমে পড়ে গেলাম। বাসা নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু আমার ভালো লাগার কারণ বাসার ভেতর নয়, বাইরে। আমাদের ও রৌশন ভাইদের বাসা পাশাপাশি। বাসার সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে নিরবিচ্ছিন্ন ফলের ও গোলাপ ফুলের বাগান। কি নেই সেখানে? আপেল, পিচ, আখরোট, আঙুর ..... আমি তাথৈ থৈ থৈ নৃত্য করতে শুধু বাকি রাখলাম। আপেল গাছে তখন ছোট ছোট ফুল ফুটছে। আমি সারাক্ষণ সেখানে সময় কাটাই। গাছে গাছে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করি কোনটাতে কেমন ফলন হবে। আখরোটের বিশাল গাছ বেয়ে তরতর করে উঠে যাই। রুশনী আপা আখরোট খুব পছন্দ করে। তার কাছ থেকে অধিক মাত্রার স্নেহ পাবার সম্ভাবনায় প্রায়ই পকেট ভর্তি করে আখরোট নিয়ে তাকে অর্ধেক দিয়ে আসি। দেখা গেলো মা নিজেও আখরোটের ভক্ত। তবে আমাকে গাছে চড়তে দিতে তার খুবই ভয় করে। আমি অবশ্য আমার গাছে চড়বার সদ্য অর্জিত দক্ষতা দেখিয়ে তাকে তাক লাগিয়ে দিলাম।

আমাদের সদর দরজার ঠিক শরীর বেয়ে দুটা আঙুর গাছ লতিয়ে উঠে গেছে উঁচু পাঁচিলের উপরে। সেখানেও ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। আমি আর রুশী প্রতিদিন নিরীক্ষণ করি তাদেরকে। নিজ ভূমি থেকে এতো দূরে এসে দাদু বাড়ির মতো বাগান পাবো কে ভেবেছিলো? বাশার ও রাতুলকে হারানোর দুঃখ খুব শীঘ্রই ভুলে গেলাম।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বাবা একটা সুযোগ পেয়ে কোয়েটায় আমাদেরকে দেখতে এলেন। বাসা দেখে তিনিও খুব খুশী হলেন। তার জীবনের অধিকাংশই কেটেছে গ্রামে। গাছপালা তার হৃদয়কেও বেশ দোলা দেয়। আমাদের বাসার পাঁচিলঘেরা চত্বরের ভেতরে বেশ বড়সড় উঠোন। বাবা যে ক'টা দিন থাকলেন, সেই উঠোনের মাটি কুপিয়ে চাষাবাদযোগ্য করে সেখানে কুমড়া গাছ ও মুলা রোপন করলেন। স্থানীয় মানুষেরা তাকে বলেছে এই এলাকায় নাকি খুবই ভালো কুমড়া হয়। বাবা চলে যাবার আগে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সেগুলো দেখভাল করার। গাছের পরিচর্যা করতে আমার কোন অনীহা নেই। রুশীর চেয়ে তারা অনেক কম ঝঞ্ঝাটের। মিল্কীর বয়েস মাস পাঁচেক হয়েছে। সে দা-দা, কা-কা করে বাড়িঘর মাতিয়ে দেয়। খুব চেষ্টা করে হামাগুড়ি দেবার, যদিও এক ইঞ্চিও এগুতে পারে না। যেমন গোলগাল হয়েছে। আমাকে অবশ্য সে খুবই তোয়াজ করে চলে। দেখলেই এক গাল হাসি দেয়। এবার যাবার সময় বাবারও একটু মন খারাপ হলো। মিল্কীকে বেশ কিছুক্ষণ কোলে জড়িয়ে রাখলেন। কিছু বললেন না। তার গাড়ি এসে তাকে নিয়ে গেলো। আমরা গাড়ির পিছু পিছু সদর রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। ইতিমধ্যেই শীতের আমেজ পড়তে শুরু হয়েছে। কোয়েটায় প্রচন্ড শীত পড়ে শুনেছি। মায়ের কোলে মিল্কীর কাঁপাকাঁপি শুরু হতেই আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের অপ্রীতিকর ইন্ধন যোগানোর প্রতিবাদে পাকিস্তান আচমকা ভারতের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালালো। এই ঘটনার পরদিনই ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত নিলো। এতোদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন ভারত সরকার প্রধান ইন্দিরা গান্ধী। এই আচমকা আক্রমণ তার সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ করে দিলো। পাকিস্তানের প্রাথমিক বিমান হামলায় ভারতের তেমন কোন ক্ষতি হলো না। খুব শীঘ্রই তারা আকাশে তাদের প্রাধান্য স্থাপিত করলো। ভারতের যে বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরিত হয় তাতে ছিলো নয়টি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, সাথে আর্মার ইউনিট এবং সহযোগী আর্মস ইউনিট। পাঁচটা ভাগে বিভক্ত হয়ে অসম্ভব দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে থাকে ভারতীয় বাহিনী। তাদের মূল লক্ষ্য ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। পথে ছোট ছোট শহরে যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীদের ঘাঁটি ছিলো সেগুলো এড়িয়ে যায় তারা। তাদের এই অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে থাকে মুক্তিবাহিনীর অসংখ্য ইউনিট। তারা পাকসেনাদের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে জড়িয়ে রাখে। পাকিস্তানি চারটি ডিভিশন বেশ জোরদার ভাবে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করলেও খুব শীঘ্রই তাদের সমস্ত প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। তাদের সমস্ত সাপ্লাই রুট ও পলায়নের পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে ঢাকার পতন হয়। পাকিস্তানের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী তার ৭৫০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. এস. অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। পশ্চিম সীমান্তেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো তাতে পাকিস্তান কোন সুবিধা করতে পারেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সংবাদে আমাদের বাংলাদেশীদের মধ্যে ভয়ানক এক আনন্দের আলোড়ন উঠলো। সকলেই আশা করতে লাগলো এবার আমরা সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবো। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বাবা কোয়েটা ফিরে এলেন ঠিক তার পরপরই। দেশে ফেরার কোন ঠিকঠাক না হলেও বাবাকে পেয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দিত হলাম। বাবার বরাবরই ক্ষেত খামারে প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহ সম্ভবত পারিবারিক সূত্রে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা দু'জনে মিলে উঠোনের সব্জি বাগানটাকে আগাছামুক্ত করলাম। কুমড়ো গাছগুলো ইতিমধ্যেই ফুল দিচ্ছে। এখানকার মাটি খুবই উর্বর। আপেল বাগানে ফুল থেকে ছোট ছোট আপেলের অবয়ব তৈরি হচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা গাছ পরখ করা। রুশী প্রায়ই আমাকে সঙ্গ দেয়। এখানে এসে অবধি প্রাকৃতিক ব্যাপারে তার আগ্রহ বেশ অদ্ভুতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা সবাই আশা করছিলাম হয়তো শীঘ্রই দেশে ফিরতে পারবো। কথাটা ভেবে ভালো খারাপ দু'ধরনের অনুভূতিই হচ্ছিলো। ভালো লাগছিলো নিজের দেশে ফিরবার আনন্দে, প্রিয়জনদেরকে আবার দেখতে পারবো। খারাপ লাগছিলো আমাদের সব্জিক্ষেত আর ফলের বাগানের কথা চিন্তা করে। যদি খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয় তাহলে না কুমড়া না আপেল

কোনটাই দেখতে পাবো। সারাদিনে ক্ষেতে ও বাগানে এতো সময় কাটাই যে ঐ দুটি স্থানের সাথে আমার নৈকট্যতা অন্যদের কৌতুহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টের কুলি ক্যাম্পে বাংলাদেশের সব সেপাই ও অফিসারদের ডাকা হলো। জানতে চাওয়া হলো তাদের মধ্যে কারা পাকিস্তানে থাকতে চায় আর কারা বাংলাদেশে চলে যেতে চায়। দু'একজন পাকিস্তানি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, তারা পাকিস্তানেই থেকে যেতে চাইলেন। বাকিরা সবাই দেশে ফিরতে উদগ্রীব। পাকিস্তান সরকার সবাইকে আশ্বস্ত করলো - দেশে সবাই ফিরে যাবে। তবে কবে সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। আত্মসমর্পণ করবার সময় ভারত পাকিস্তানের প্রায় ৭৫০০০ সৈন্যকে বন্দী হিসাবে নেয়। তাদেরকে মুক্ত করবার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশী সৈন্য ও অফিসারদেরকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই কথা শুনে মায়ের নয়নে আবার জলের স্রোত দেখা দিলো। অস্বীকার করবো না, আমি কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেলাম। আর দু-এক মাস সময় পেলেই আমার চলে। ঠিক হয়েছে, কোয়েটাতে যে যেখানে আছে সেখানেই বাস করতে থাকবে। বাবাদেরকে প্রতিদিন একবার করে মাঠে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। কেউ পালিয়ে যাক এটা পাকিস্তান চায় না।

কোয়েটাতে ডিসেম্বর মাস থেকেই বেশ শীত পড়তে শুরু করে। শিলাবৃষ্টি ও তুষার দু'টাই নাকি পড়ে। আমরা ইতিমধ্যেই শীতের প্রকোপটা টের পেতে শুরু করেছি। প্রতিদিন রাতে হিটার দিয়ে পানি গরম করে আমরা তিন ভাই বোন গোছল করি। কোন রকমে শরীর মুছে, নাইট ড্রেসটা পরেই কম্বলের নীচে। মিল্কী এখন প্রায় ছয় মাসের। তার ভাব দেখলে মনে হয় সব কিছুই সে পরিষ্কার বুঝতে পারে। আমাকে দেখলে ইদানিং তার উত্তেজনা আরো বাড়ে। বিশেষ করে আমি যখন দরজা খুলে বাইরে যাই তখন তার হাত পা ছোড়াছুড়ি দেখার মতো। আমি মাঝে মাঝে খুব সাবধানে তাকে কোলে নিয়ে বাগান ঘুরিয়ে আনি। মা আপত্তি করেন, ফেলে দেই যদি। কিন্তু মিল্কীর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দেখে না করতে পারেন না। রুশীর খুব ইচ্ছা মিল্কীকে কোলে নিয়ে বাগানে ঘুরবে। ও নিজেই রোগা-পটকা। কোন রকমে হেঁটে বেড়ায়। একদিন ত্যক্ত হয়ে দিলাম ওর কোলে তুলে। দুই পা গিয়ে মিল্কীকে সহ মাটিতে ধপাস করে পড়লো। পেছনে ব্যথা পেয়ে বেচারির চোখের জল আর থামে না। কিন্ত তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে মিল্কী মাটিতে লুটোপুটি খেতে খেতে খিল খিল করে হাসতে লাগলো। রুশনী আপা ও রৌশন ভাইও মিল্কীর খুব ভক্ত। বিশেষ করে রুশনী আপা সুযোগ পেলেই মিল্কীকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে চলে যায়। তার বয়েসী দু'একটা মেয়ের সাথে তার পরিচয় হয়েছে। মিল্কী অচিরেই তাদের দু'জনার খুব ভক্ত হয়ে গেলো। তাদের আদর ও প্রশ্রয়ে আমাদের তিনজনেরই সময় ভালো কাটে।

এরই মধ্যে একদিন একটা অযাচিত কর্ম করে ফেললাম। স্থানীয় মুদির দোকানে গিয়েছিলাম বাবার সাথে। রাতের বেলা। দোকানে আলো তেমন প্রবল ছিলো না। বাবা যখন এটা সেটা কিনছেন আমি তখন সাজিয়ে রাখা নানান ধরনের মিষ্টির সমারোহ দেখছি। সেগুলো দেখে এমন লোভনীয় মনে হলো যে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। টুক করে একটা মুখের মধ্যে

গলিয়ে দিলাম, মুহুর্তের জন্য বিস্মৃত হলাম, দোকানের জিনিষ কিনে খেতে হয়। একটু পরেই অবশ্য কথাটা স্মরণ হলো। বিপদে পড়লাম। চিবাতেও পারি না, ফেলতেও পারি না। দু'টার প্রত্যেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। হয় বাবা নয়তো দোকানী দেখে ফেলবে। আমি মিষ্টিটাকে মুখে ঢুকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লক্ষ্য করলাম দোকানী মুচকি মুচকি হাসছে। আমি নিরীহ মুখে এদিক সেদিক তাকাই। কিন্তু বাবা শেষ পর্যন্ত টের পেয়ে গেলেন। - তোর মুখে কি খোকা?
আমি কথা বলি না। মুখ খুললেই তো বিপদ। দোকানী হা-হা করে হাসতে লাগলো। - ও কিছু না। বাচ্চা মানুষ, লোভ সামলাতে পারেনি।
বাবা ভয়ানক রাগ করতে লাগলেন। –তোর খেতে ইচ্ছে হলে তুই আমাকে বললি না কেন? ফেলে দে ওটা।
ফেলে দিলাম। বাবা অবশ্য কিনলেন বাসার জন্য। ফিরতি পথে মাথা নীচু করে ফিরি। আচমকা এমন একটা অদ্ভুত কাজ কেন করলাম নিজেও বুঝতে পারিনা। বাবাও গম্ভীর হয়ে থাকলেন। তিনি খুবই নীতিপরায়ণ মানুষ। এই ধরণের পদস্খলন সহজভাবে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে।
বাসার কাছাকাছি এসে আমি নীচু গলায় বললাম - আর করবো না, বাবা। দেখে লোভ লাগলো।
–অন্যের জিনিষ কখনো না বলে নিতে হয় না। মনে থাকবে? মাথা নাড়ি। বাসায় ঢুকে মিষ্টির প্যাকেটের অর্ধেকটা সাবাড় করে দেই। মা বললেন - এতো মিষ্টি খাচ্ছিস! দাঁতে তো এর মধ্যেই আরো পোকা হয়েছে।

আমি মায়ের কথার জবাব দেই না। মনের আশা মিটিয়ে খাই। ভবিষ্যতে যেন এমন লোভের কবলে আর না পড়তে হয়। কপাল ভালো, কোন এক রহস্যময় কারণে মাকে আমার অপকর্মের কথা বাবা বললেন না। অনেক গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচা গেছে। মা একবার বকাবকি শুরু করলে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। বিরক্তির একশেষ হতে হয়।

একরকম দেখতে দেখতেই আমাদের সব্জি ক্ষেতটা জীবন্ত হয়ে উঠলো। মাটির উর্বরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়ে সারা উঠোন ভরে গেলো কুমড়াতে ও মুলাতে। ইয়া বড় বড় এক একটা লাল কুমড়া ও সাদা মুলা। আমরা নিজেরা সকাল বিকাল খেয়ে, রুশনী আপাদেরকে দিয়ে, পাড়াপড়শীদেরকে বিলিয়েও শেষ করতে পারলাম না। মা জমিয়ে রাখলেন। কুমড়া নাকি অনেকদিন ভালো থাকে। আপেল বাগানে আপেলগুলোও বেশ বড় বড় হয়েছে। আর কয়েকটা দিন গেলেই খুব সুস্বাদু হবে। আমি দু'একটা পেড়ে খাই, এখনো কচি। ছোট ছোট গাছগুলো আপেলের ভারে মাটিতে নুড়ে পড়েছে। চিন্তায় পড়ি এতো আপেল দিয়ে আমরা কি করবো। স্রষ্টা বোধহয় আমার মনের কথা শুনতে পেলেন। হঠাৎ করে একবার ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপেলগুলোর জন্য খুবই দুঃশ্চিন্তা করতে লাগলাম। শিলায় হয় অধিকাংশ আপেল পড়ে যাবে নয়তো নষ্ট হবে। পরিপূর্ণ হবার সময় পাবে না। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ছুটলাম বাইরে। বাবাও আমার সাথে এলেন। দু'জনে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা গাছ দেখলাম। যা ভেবেছিলাম ক্ষতি তার চেয়ে বেশীই হয়েছে। গাছে অক্ষত কোন আপেল নেই।

অধিকাংশ আপেলই এইভাবে গাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সব তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। মা ভালো জেলি বানাতে পারেন। সারাদিন ধরে ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল তুললাম আমরা সবাই মিলে। যেগুলো নীচ থেকে হাতে পাওয়া যায় না সেগুলো তোলার জন্য এক লাফে গাছে চড়ে গেলাম। আমার দৌড় ঝাঁপ দেখে মিন্কীর আনন্দ আর ধরে না। রুশনী আপারাও সবাই বেরিয়ে এলো। বেশ একটা উৎসবের আমেজ পেলাম। সেই আপেল পরবর্তী কয়েকটা দিন ধরে বড়বড় হাড়িতে সমানে জাল দিলেন মা। গন্ধে চারদিক ভরে গেলো। এই গন্ধ তেমন প্রীতিকর কিছু নয়। আপেলের শুধুমাত্র ভেতরের সাদা অংশটুকু পানিতে মিশিয়ে জাল দিতে হয়। যখন সেটা নরম হয়ে যায় তখন চিনি, রং ইত্যাদি মেশানো হয়। তখনই জেলির স্বাদ উদ্রেককারী গন্ধটা পাওয়া যায়। ক'দিন বাদেই আমাদের বাসা আপেলের জেলীর বৈয়ম, ডিব্বা ও কাঁচের জারে ভরে গেলো। অনেককে দিয়ে থুয়েও যা থাকলো তাতে বছরখানেক চলে যাবে।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আচমকা একটি নতুন সমস্যা হল। পাকিস্তানের অন্যান্য কিছু এলাকা থেকে কয়েকজন বাংলাদেশী আর্মি অফিসার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার ব্যাপারটা পছন্দ করলো না। কোয়েটায় যারা আছে তারা যেন ঐ জাতীয় চেষ্টা না করে সেই জন্যে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিলো তারা। ঠিক হলো আমাদের সবাইকে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তুলবে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে হোটেল জিলতান। সাধারণত যে সমস্ত আর্মির লোকজন ট্রেনিং এ আসতো তারাই সেখানে থাকতো। আমাদের সবাইকে সেখানে নিয়ে তোলা হলো। জোয়ানদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো কুলি ক্যাম্পে। কোয়েটার এমন চমৎকার বাসা আর বাগান ছেড়ে চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা হোটেল জিলতানের স্বল্প পরিসরে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে যাবার অনুভূতি হলো আমার। প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সুইট দেয়া হলো। বাসার তুলনায় অনেক ছোট হলেও একেবারে মন্দ নয়। বাবার মুখেই শুনলাম এই ব্যবস্থা খুবই সাময়িক। খুব শীঘ্রই আমাদের সবাইকে অন্য কোথাও সরানো হবে। কোথায় সেটা কেউ জানে না। আমরা প্রায় কয়েকশ' মানুষ এখানে। সবার স্থান সংকুলান হয় এমন জায়গাতো পেতে হবে। দু'একদিন যেতেই আমার প্রাথমিক মন খারাপটা কেটে গেলো, প্রধানত যখন আবিষ্কার করলাম এটা একদিক দিয়ে মন্দের ভালোই হয়েছে। শুধু যে বাশার, রাতুল ও মতির সাথে প্রতিদিন সকাল বিকাল দেখা হয় তাই নয়, কম করে হলেও আরো সাত-আটটা সমবয়েসী ছেলে পাওয়া গেছে। ক'দিনেই জমে উঠলো আমাদের। দল বেঁধে ছুটাছুটি করে খেলি আমরা। লেখাপড়া, স্কুলের কোন বালাই নেই। শুধু খেলা, খেলা, খেলা। বড়রাও যে আমাদের চেয়ে বিশেষ পিছিয়ে থাকলো তা নয়, বিশেষ করে বাবারা। এখনও সবাইকে সকালে একবার হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু তারপরে বাকি দিনটা তারা আড্ডা দিয়ে কাটান। হোটেলের সামনে বেশ প্রশস্ত মাঠ। মাঠের প্রায় কেন্দ্রে একটা ভলিবল মাঠ। কয়েকদিন পরেই দেখলাম সেখানে তারা দল বেঁধে খেলতে নেমে পড়েছেন। মহিলারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয় খেলা দেখেন নয়তো গলা বাড়িয়ে আলাপ জুড়ে দেন। কাছাকাছি বসবাস করার ভালো দিকগুলো চোখে পড়তে শুরু করলো। পাকিস্তান আসা অবধি এমন হৈ চৈ আর আনন্দঘেরা পরিবেশ

চোখে পড়েনি। বড়দের দেখাদেখি আমরা ছোটরাও নানান ধরনের খেলা খেলতে লাগলাম। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি। হকিস্টিক, ব্যাট নেই তাতে কি, গাছের ডালপালা তো আছে। কিন্তু এইসব দিয়ে খেলা বিশেষ জমে না। বড়রা ভলিবল খেলে বলে মাঠে আমরা ভালো করে ফুটবলও খেলতে পারি না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলাম আমরা। কে প্রথম শুরু করলো মনে নেই কিন্তু সবাই যেন খেলাটা লুফে নিলো। খেলাটার নাম দেয়া হলো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দুটি দলে বিভক্ত হলাম আমরা। আমি, বাশার, রাতুল, মতি, রঞ্জু, অভি এক দল। তান্না, মিশন, মিজান, আমান, জ্যোতি, রনি, অন্য দল। দুই একটা মেয়ে আমাদের সাথে যোগ দেবার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদেরকে নেয়া হলো না। একটু খেলেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পুতুল নিয়ে খেলতে বসে যায়। যুদ্ধের মাঝখানে এই জাতীয় কান্ড কারখানা কারোরই পছন্দ হয় না। আমাদের বন্দুক হলো স্বাভাবিকভাবেই গাছের ডালপালা। গ্রেনেড হলো ঢিল। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ল্যাম্পপোষ্ট হচ্ছে আমাদের দামামা। পাথর দিয়ে সেটাতে ঢং ঢং ঢং শব্দ করে আমাদের খেলা শুরু হয়। চলতে থাকে যতক্ষণ না একপক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিকালে বাবারা যখন ভলিবল খেলতে শুরু করে তখন আমরাও আমাদের খেলায় মত্ত হয়ে উঠি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে খেলে কোন পক্ষই ক্লান্ত হয় না। ধা - ধা - ধা - দৌড় দৌড় -- গাছের আড়ালে লুকানো ..... লাফিয়ে একটা ডিচের মধ্যে পড়া .... ধা - ধা ধা ..... গ্রেনেড ছোড়া .....। প্রায়শঃই আমাদেরকে বাসায় ঢোকানোর জন্য বাবা-মাদেরকে ধমকা-ধমকি করতে হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা দক্ষ সৈনিক হয়ে উঠলাম। হোটেলের প্রাঙ্গনের ভেতরে বিভিন্ন লুকানোর জায়গাগুলো আমাদের নখদর্পনে চলে এলো। এমনকি খেলা শুরু হবার আগে আমরা প্রতিটি দল যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়েও গুরুত্বের সাথে আলাপ করতে শুরু করলাম। আমার দলে আমি স্ব-ঘোষিত কমান্ডার-ইন-চিফ। অন্য দলে আমান। সে সাঈদ আঙ্কেল ও মিশা আন্টির একমাত্র ছেলে। বয়েসে আমাদের চেয়ে সামান্য বড়ই হবে। বেশ গাট্টা গোট্টা, একটু পাগলাটে ধরনের। তাকে সবাই খানিকটা সমীহ করে চলে। মারপিট লাগলে দু'ঘা খেতে হবে সন্দেহ নেই। আমরা সবাই অধীর হয়ে বিকালের প্রতিক্ষায় থাকি। সকালের দিকে মায়েরা বাইরে যেতে দিতে চান না। লুকিয়ে চুরিয়ে বের হওয়া গেলেও তেমন চুটিয়ে খেলা যায় না। দুপুরের আঁচটা কমে গেলে যেই বাবারা একে একে মাঠে নামতে থাকেন, আমরা সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে একলাফে নীচে। ঢং-ঢং-ঢং। বিকট চিৎকার দিয়ে আমরা দুই দল দুই দিকে আড়াল নেই। ঠা ঠা ঠা .....।

আমানের সাথে আমার পরিচয় হোটেল জিলতানে ওঠার পর। কোন এক অজানা কারণে আমাদের মধ্যে বিশেষ খাতির হয়নি। শত্রু হিসাবেই আমরা বেশ মানিয়ে গেলাম। পরস্পরের মুখোমুখি হলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বিশেষ কোন কথাবার্তাই হয়না। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু হবার পর সম্পর্কের আরো অবনতি হলো। এখন পরস্পরকে দেখলে আমরা চোখ কুঁচকে ফেলি। আমান হয়তো গম্ভীর কণ্ঠে বলে - কাল আমরা জিতেছি।

- বাজে কথা বলিস না। আমি মেশিনগান দিয়ে তোদের সবক'টাকে মেরেছি।

- না! আমি বোমা মেরে তোদের সবাইকে উড়িয়ে দিয়েছি।

এই জাতীয় সংলাপের পর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবতই আমাদের উত্তেজনার মাত্রা অনেক উঁচুতে থাকে। জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্ত কেউই কোন সন্দেহ রাখতে চাই না। আমি আমার সঙ্গীদেরকে নিয়ে এক দিক থেকে অন্য দিকে লাফিয়ে নামি ... ঠা ঠা ঠা চলতে থাকে ..... আমান সমানে বোমা ছুড়তে থাকে। প্রথম প্রথম বোমা ছোড়ার ব্যাপারটা সারা হতো হয় হাতের অভিনয়ে নয়তো খুব ছোট ঢিল ছুঁড়ে। আমাদের মন কষাকষি বাড়ার পর আমাদের ঢিলের সাইজ বড় হতে থাকলো। আমি অবশ্য তাতে মোটেই শংকিত নই। শত্রু ভয়ংকর না হলে যুদ্ধ করে আনন্দ কোথায়। আমানের ঢিল থেকে নিজেকে রক্ষা করে, আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাই ওর কাছাকাছি। হঠাৎ পেছন দিক থেকে – হ্যান্ডস আপ! সারেন্ডার। ব্যস, খেলা খতম। কে জয়ী সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকে না।

পর পর কয়েকদিন পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়ে আমানের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। সে মনে মনে যে এক ভয়াবহ প্ল্যান করছিলো টেরও পাইনি। সেদিন আমরা রোজকার মতই খেলছি। আমি আমার প্রিয় একটা ডিচে নিজেকে লুকিয়ে প্রচন্ড গুলি ছুড়ছি ঠা ঠা ঠা। শত্রুপক্ষ কেউ সামনে আসবার কথা চিন্তাও করতে পারবে না। কিন্তু আমান আজ নিয়ম ভঙ্গ করলো। সে প্রচন্ড গোলাগুলির তোয়াক্কা না করে তার গ্রেনেডসহ দিব্যি হেঁটে আমার খুব কাছে চলে এলো। আমি আমানের শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম - আমান, তুমি ডেড। শুয়ে পড়ো।
আমান চোখ-মুখ কুঁচকে চিৎকার করলো - না, আমি ডেড না। আমার শরীরে বুলেটপ্রুফ কোট আছে।
আমি প্রত্যুত্তর দেবার আগেই টপাটপ গ্রেনেড পড়তে লাগলো। আমি কয়েকটাকে এড়াতে পারলেও একটা বড়সড় ঢিল সোজা আমার কপালে এসে আঘাত করলো। সামান্য একটু ব্যথা টের পেলাম, কিন্তু পর মুহুর্তে কপাল দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বের হতে দেখে বুঝলাম আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছি। বাবা মাঠে ভলিবল খেলছেন। এক দৌড়ে সেখানে গেলাম। পিছে পড়ে থাকলো রক্তের লাল রেখা। আমান ইতিমধ্যেই গা ঢাকা দিয়েছে। বাকি ছেলেরা আমার পিছু পিছু আসছে। বাবা আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। মুহুর্তে একটা তোলপাড় পড়ে গেলো। এক ঝটকায় আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বাসার দিকে দৌড় দিলেন তিনি। পেছন পেছন এলো ছেলেদের পুরো দল এবং বাবার কয়েকজন বন্ধু। বাসায় পৌঁছে কপালে স্টিচ দিলেন বাবা। ভালোই কেটেছিলো কারণ পাঁচ-ছ'টি সেলাই দিতে হলো। বেশ রক্তপাত হওয়ায় খুব দুর্বলবোধ করছিলাম। কিন্তু সে অবস্থাতেই মায়ের কড়া বকুনি শুনতে হলো। –কতবার বলেছি এই সব খেলা বন্ধ কর। এবার হলো? আবার যদি খেলতে দেখি তাহলে আমি নিজেই তোর কপাল ভাঙবো।

মায়ের বকাবকি শুনে বন্ধুরা কেটে পড়লো। বাবা আর খেলতে গেলেন না। আমার পাশে বসে থাকলেন। একটু পর পর জ্বর মাপতে লাগলেন। রুশী চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছিলো। এতো রক্ত টক্ত দেখে সে খুব ঘাবড়ে গেছে। অনেক ডাকাডাকিতেও কাছে এলো না। সবচেয়ে যে খুশী হলো সে মিন্কী। বিকাল বেলাটা তার সবচেয়ে খারাপ কাটে। আমরা সবাই বাইরে চলে

যাই, সে একা মায়ের সাথে থাকে। মা তাকে আমার বিছানায় ছেড়ে দিতে সে আমার বুকের উপর উঠে মহা আনন্দে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। তার আনন্দ দেখে আমার ব্যথাও যেন খানিকটা কমে গেলো।

পরবর্তি কয়েকটা দিন শুয়ে বসেই কাটাতে হলো। বাসার বাইরে পা দেবার চেষ্টা করলেও মা রক্তচক্ষু মেলে তাকান। বাশার, রাতুল দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে, সাহস করে নক করেনি। ওদের ফিসফিসানি ঠিকই আমার কানে এসেছে। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আপাতত বন্ধ। আমানের কান্ডের কথা কারো জানতে আর বাকি নেই। তাকেও বাসায় বন্দী করা হয়েছে। আমি বাবাকে বললাম - ওর কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত।

বাবা মুখ টিপে হাসলেন। –তোদের দু'টারই কোর্ট মার্শাল হওয়া দরকার। এতো খেলা থাকতে এইসব যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলছিলি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেই না। বাবাকে কি করে বোঝাবো এই খেলার মধ্যে কি রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা।

একদিন রাতে আমানকে নিয়ে ওর বাবা-মা সাঈদ আঙ্কেল ও মিশা আন্টি এলেন। দু'জনই আমাকে খুব আদর করলেন। আন্টি আমার জন্যে হালুয়া রান্না করে নিয়ে এসেছিলেন। মজা করে খেলাম। সবচেয়ে আনন্দ হলো যখন তারা আমানকে ধমকে ধমকে আমার সম্মুখে পাঠালেন ক্ষমা চাইতে। আমান মুখটাকে ভয়াবহ রকম কুঁচকিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে কোন রকমে আবৃতি করলো –ভুল হয়ে গেছে, আর করবো না।

আন্টি আরো কি কি বলতে বললেন কিন্তু আমান সেই যে গাড়োলের মতো মুখ বন্ধ করলো, তার মুখ থেকে আর একটা শব্দও বের হলো না।

বাবা মা দু'জনই আমাকে শর্ত দিলেন। আমার সেলাই না শুকানো পর্যন্ত আমি দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে পারবো না। ফলে বিকাল বেলাটা আমাকে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে হয়। বাশার, রাতুল, জ্যোতি, রনিরা এখন ছোঁয়াছোঁয়ি খেলে। আমানকে তারা প্রথম কয়েকদিন খেলতে নেয়নি। আমান একাকি দাঁড়িয়ে থাকতো। আমার দেখে খুব খারাপ লাগলো। আমি রাতুলকে অনুরোধ করতে ওরা ওকে খেলতে নিলো। ভেবেছিলাম আমান আমার বন্ধু হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো আমান আমাকে দেখলে মুখ শক্ত করে ফেলে।

ইতিমধ্যে আরেকটি বড়সড় ব্যাপার ঘটলো। বাবাদের ভলিবল খেলায় ভয়ানক গোলমাল হলো। বিকেলে মা মিল্কীকে নিয়ে পাশের বাসায় গেছেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের স্বাভাবিক কার্যক্রম লক্ষ্য করছি। রাতুলরা খেলছে। বাবাদের ভলিবল খেলা শুরু হয়েছে। আজ মনে হয় খেলা খুব জমেছে। আমাদের ছোটদের মতো তাদেরও দু'টো দল গড়ে উঠেছে, আমি সেটা ইতিমধ্যেই খেয়াল করেছি। প্রত্যেকদিন ভলিবল খেলার মাঠে এই দু'টো দলই মুখোমুখি হয়। এক দলে বাবা, সাঈদ আঙ্কেল, বজলুর আঙ্কেল, জাফর আঙ্কেল. জ্যোতির বাবা. রনির বাবা এবং আরো দু'জন। অন্য দলে আলতাফ আঙ্কেল, ক্যাপ্টেন সুজন, মেজর নাঈম, শিরিনের আব্বা, অভির বাবা, রঞ্জুর বাবা এবং আরো দু'জন। একেক দলে আটজন করে। মাঝে মাঝে তারও বেশী হয়। ক্যাপ্টেন, মেজরই বেশী, তবে কর্ণেলও বোধহয় আছেন দু-একজন। বাবাদের দলের জাফর আঙ্কেল মেজর, বাকিরা সবাই ক্যাপ্টেন। আলতাফ

আঙ্গেলের দলে তিনি ও নাঈম আঙ্কেল মেজর, বাকিরা ক্যাপ্টেন। তার দলে ক্যাপ্টেন সুজন খেলছে। এই লোকটা অতিরিক্ত চিৎকার করে এবং হঠাৎ হঠাৎ ভয়ানক ক্ষেপে যায়। তার রাগের বহর ইতিমধ্যেই সবাই বেশ কয়েকবার দেখেছে। কিন্তু কোনবারই খারাপ কিছু ঘটেনি, প্রধানত অন্যদের কারণেই। কেউই ঝগড়া-ঝাটি করতে চায় না। কিন্তু আজ দেখলাম ক্যাপ্টেন সুজন কোন কারণে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাবাকে শাসাতে লাগলেন। বাবা এমনিতে শান্ত মানুষ হলেও রেগে গেলে তার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। দূর থেকেও বুঝলাম ক্যাপ্টেন সুজনের সাথে তার ঝগড়া লেগে গেছে। খুব সম্ভবত একটা পয়েন্ট নিয়ে। ক্যাপ্টেন সুজনের সার্ভিস বাবা দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ সেটা লাইনের বাইরে যাচ্ছিলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন সুজন সেটা মানতে রাজি নয়। তার ভাষ্য অনুযায়ী সার্ভিস লাইনের ভেতরেই পড়েছে। দুই দলেরই অন্যান্য সদস্যরা প্রথমে ব্যাপারটা মেটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভালোর পরিবর্তে খারাপই হলো। একটু পরেই দেখলাম ঝগড়া শুধু বাবা ও ক্যাপ্টেন সুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দুই দলের মধ্যেই শুরু হয়েছে। উচ্চকণ্ঠের চিৎকার চেঁচামেচিতে বাচ্চারা খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে, বাসার ভেতরে যারা ছিলো সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে কয়েকজনের মধ্যে হাল্কা হাতাহাতিও শুরু হলো, বাবাকে দেখলাম বজলুর আঙ্কেল টেনে পেছনে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন সুজনের সাথে এখন উঁচু গলায় তর্ক করছেন মেজর জাফর। আচমকা ক্যাপ্টেন সুজন পকেট থেকে কিছু একটা বের করে মেজর জাফরকে আক্রমণ করলেন। আলতাফ আঙ্কেল হাত বাড়িয়ে তাকে চেপে ধরলেন। ধস্তাধস্তিতে তার হাতের ছুরিটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জাফর আঙ্কেল চিৎকার করতে লাগলেন - তোমার কোর্ট মার্শাল করবো। তুমি দেশে ফিরবে না?

বেশ কয়েকজন মহিলা বাসা ছেড়ে মাঠে চলে গেছেন ইতিমধ্যে। নিজের স্বামীদেরকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন তারা। মা দেখলাম মিল্কীকে কোলে নিয়ে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন মাঠের দিকে। বজলুর আঙ্কেল ও সাঈদ আঙ্কেল বাবাকে একরকম টেনে ভীড় থেকে সরিয়ে এনেছেন। মা খপ করে বাবার হাত ধরে বাসার দিকে টানতে লাগলেন। বাসায় ফিরে এসেও বাবা বেশ কিছুক্ষণ প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে থাকলেন। বারান্দায় গিয়ে চিৎকার করে বকাবকি করতে লাগলেন। মাঠের পরিস্থিতি ততক্ষণে খানিকটা ভালো হয়েছে। ক্যাপ্টেন সুজনকে বেশ কয়েকজন ধরে রেখেছে। কয়েকজন ইতিমধ্যে বাসায় চলে গেছে। সমস্যা সম্পূর্ণ মিটতে আরো ঘন্টাখানেক লাগলো। কিন্তু এই ঘটনার জের চললো বেশ কিছুদিন। ভলিবল খেলার মাঠের দলাদলি বাস্তব জীবনেও চলে এলো। আলতাফ আঙ্কেলের সাথে বাবার আগে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিলো। এই ঘটনার পর সেখানে শীতলতা নেমে এলো। দেখা হলে 'কেমন আছো', 'ভালো আছি' উপরে আলাপ হয় না। ভলিবল খেলাও বেশ কয়েকদিন বন্ধ থাকলো। ইতিমধ্যে আমার কপালের স্টিচ শুকিয়ে এসেছে। ষ্টিচ খুলে দিলেন বাবা। কপালে বেশ বড়সড় একটা দাগ হয়ে গেছে। আয়নায় দেখে মনটা খুশীই লাগলো। যুদ্ধের ক্ষত, গর্বের বিষয়। সেদিনই বিকালবেলা লাইট পোষ্টে ঢিল দিয়ে দামামা বাজালাম ঢং ঢং ঢং ..... প্রথমে কয়েকজন কৌতুহলী হয়ে দেখতে এলো ঘটনাটা কি। শীঘ্রই আমাদের ছেলেদের দলের সবাই

হাজির হলো, এমনকি আমান পর্যন্ত। ঠিক হ'লো কোন ছোড়াছুড়ি চলবে না। শুধু ধা ধা ডা ডা আর হ্যান্ডস আপ, সারেন্ডার। সবাই তাতেই সই। আমরা আবার পাড়া কাঁপিয়ে ভয়ানক যুদ্ধে মেতে উঠলাম। কয়েকদিন পর বাবাদের ভলিবল খেলাও আবার শুরু হলো। তবে ক্যাপ্টেন সুজনকে আর খেলার মাঠে দেখলাম না। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে আমাদেরকে ফোর্ট সান্ডামান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

## ফোর্ট সান্ডামান

ফোর্ট সান্ডামান নামের ছোট্ট শহরটি অবস্থিত হলো জোব উপত্যকায়। জোব মানে হচ্ছে পানির প্রস্রবন। খুব সম্ভবত জোব নদীর উৎস থেকেই এই নামকরণ। এই এলাকাটি বেলুচিস্তানের অন্তর্গত, পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও আফগানিস্তান বর্ডারের কাছাকাছি। উপত্যকাটি তার পার্বত্য সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক কারণে সমগ্র পাকিস্তানেই বিখ্যাত। এই উপত্যকার শুরু সমুদ্র সীমা থেকে ৭৫০০ ফুট উঁচু মুসলিমবাগ থেকে এবং শেষ ১০০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ফোর্ট সান্ডামান-এ। শহরটির নাম রাখা হয়েছিলো স্যার রবার্ট সান্ডামান এর সম্মানে, যিনি এই এলাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। তিনি ১৮৯০ সালের দিকে এই এলাকায় বেলুচিস্থানের গর্ভণর জেনারেলের পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ফোর্ট সান্ডামান কোয়েটা থেকে প্রায় তিনশ' কিলোমিটার। * বর্তমান নাম জোব। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুলাইয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ফোর্ট সান্ডামান নাম পরিবর্তন করে জোব রাখেন।

আমরা আবার ট্রেনে উঠলাম। আরেকটি অবিস্মরণীয় যাত্রা। পাহাড়ের পর পাহাড় ও গুহার পর গুহা পেরিয়ে অবশেষে ফোর্ট সান্ডামান পৌঁছালাম আমরা। পাইনের জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি এলাকার মাঝখানে ছোট একটি শহর। আমাদের স্থান হলো এখানে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্টে। অফিসার্স হাউসিং প্রতুল না হওয়ায় একই বাসার মধ্যে দুটি পরিবারকে থাকতে বলা হলো। আমাদের এবং মেজর ইউনুসের কপালে জুটলো একটি দুই বেডরুমের বাসা। ইউনুস আঙ্কেলের দুটি ছেলে - তান্না ও মিজান। আমরা তিন ভাই বোন। একটি করে কামরার মধ্যে পুরো পরিবার নিয়ে থাকাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলো। বাবা নতুন বাসার জন্য আবেদন করলেন। জানতে পারলেন অফিসার্স হাউজিং এ এর চেয়ে ভালো কোন ব্যবস্থা হবে না তবে জেসিওদের জন্য বরাদ্দ হাউজিং এ বাসা ফাঁকা আছে। বাবা সাথে সাথেই প্রস্তাব লুফে নিলেন। আমরা আবার বাক্স পেটরা বেঁধে, তান্না ও মিজানকে বিদায় জানিয়ে নিকটেই অবস্থিত অন্য বাসায় চলে এলাম। এই বাসাটাও দুই বেডরুমের কিন্তু পুরোটাই আমাদের। বাবা-মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারা মিক্কীকে নিয়ে একটা ঘর দখল করলেন, আমি আর রুশী অন্যটাতে। আমাদের দু'জনার জন্য আলাদা খাটের ব্যবস্থা করা হলো। দেখা গেলো প্রায় প্রতিদিনই ধপাস ধপাস করে ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে যায় রুশী। কোন কোন রাতে সে খাটের উপরে ঘুমালেও সকালে তাকে আমরা খাটের নীচে আবিষ্কার করি। এটা একটা খুব মজার ব্যাপার

হয়ে দাঁড়ালো। মিল্কী এখন দু'এক পা হামাগুড়ি দেয়। নতুন বাসায় এসে সেও যেন ভয়ানক খুশী।

এখানকার বাসাগুলো পাশাপাশি সারি বেঁধে দাড়ানো। ঢালু ছাদ। ঠিক সামনে দিয়েই চলে গেছে পিচ ঢালা রাস্তা। রাস্তার বরাবর একটার পর একটা উচু লাইটপোষ্ট। অফিসার্স কোয়ার্টার কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। প্রায়ই আমি সেখানে চলে যাই বাশার, রাতুলদের সাথে খেলার জন্য। রৌশন ভাই ও রুশনী আপারা বেশ বড় সড় বাসা পেয়েছেন। সুযোগ পেলেই তাদের ওখানে চলে যাই। বাবার সাথে আলতাফ আঙ্কেলের মনোমালিন্য এখনো অল্পবিস্তর রয়েছে। ফলে পারিবারিক ক্ষেত্রে শীতলতা বজায় থাকলেও আমাদের সম্পর্কে কোন অবনতি হলো না। মাঝে মাঝেই রৌশন ভাই বা রুশনী আপা আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়।

একদিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের পার্শ্ববর্তি আরেকটা বাসায় এসে উঠছে আমানরা। আমানের সাথে আমার সম্পর্ক কপাল ফাটার পর থেকে খুবই ঠান্ডা ধরনের। একসাথে খেলাধুলা করলেও আলাপ খুব একটা হয়নি। আমাদের বাসায় এসে ক্ষমা চাইবার ব্যাপারটা মনে হয় তার আঁতে লেগেছিলো। আমাকে দেখলেই তার মুখ কালো হয়ে যায়। ভালো করে দেখলেই ব্যাপারটা ঝট করে ধরা যায়।

ফোর্ট সান্ডামান আসা অবধি আমাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বন্ধ ছিলো। প্রধান কারণ সময়টা শীতকাল। এই এলাকাতে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। তুষারপাতও হয়। আমাদের গরমের শরীর। সামান্য ঠান্ডাতেই আমরা কাবু হয়ে যাই। আমাদের সবারই সর্দিকাশি লেগেই থাকলো। তবে তার মধ্যেও বেরিয়ে পড়তাম। নিদেন পক্ষে বিকেল বেলাটা বন্ধুদের সাথে দেখা না হলে মনটা ভালো লাগে না। অফিসার্স হাউজিং এ যাবার পথে প্রায়ই আমানের সাথে দেখা হতে লাগলো। সহজেই বুঝতে পারলাম আমাকে বের হতে দেখলে সেও বেরিয়ে আসে। খাতির হতে বেশিক্ষণ লাগলো না। একদিন নীরবে পাশাপাশি হাটতে হাটতে আমি থমকে দাঁড়ালাম। - আসো আমরা বন্ধু হই। আমান ঠোট উল্টে আমাকে নিরীক্ষণ করলো। নীরবে মাথা নাড়লো সে। বালকদের স্বাভাবিক নিয়মে তর্জনী মিলিয়ে বন্ধুত্বের সংকল্প করলাম আমরা। আমি বললাম - আমার কপাল ঠিক হয়ে গেছে। আমান মুচকি হাসলো। সে কখনই বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কিন্তু তার হাসির প্রচুর অর্থ আছে। পরিষ্কার বোঝা গেলো সে মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছে।

পরদিন বিকালে তুষার পড়লো সামান্য। মাঠ-ঘাট, রাস্তা ঢেকে গেলো পাতলা শ্বেতধবল তুষারের আস্তরণে। মা আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন এই আবহাওয়ায় বাইরে যাওয়া যাবে না। মনটা অবশ্য বড় নিশপিশ করছে। আমান কি করছে জানতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু মায়ের জ্বালায় ঘর থেকে পা বের করাই সমস্যা হয়েছে। আচমকা আমাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠলো ঢং ঢং ঢং। রাস্তার লাইটপোষ্টে কেউ পাথর দিয়ে দামামা বাজাচ্ছে। আমার সাথে সাথে মাও শুনলেন। ভয়ানক কণ্ঠে সতর্ক করলেন - বাইরে গেলে পা ভাঙবো তোর।
আমার ছটফটানি দেখে বাবা হাসলেন। –যাক না একটু। বেশী দুরে যাবি না।

মা মুখ ঝামটা দিলেন - তোমার জন্যেই একেবারে মাথায় উঠছে এটা। যখন তখন যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। আমার কোন কথাই শোনে না .....

আমি মায়ের বকবকানি শোনার জন্য অপেক্ষা করি না। এক দৌড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। যে দৃশ্য দেখি তাতে আমার নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি না। অফিসার্স হাউজিং থেকে সমস্ত ছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে - বাশার, রাতুলসহ আরো সাত আটজন। দামামা বাজাচ্ছে আমান। মায়ের মেজাজের ভয় তাদের সবারই। আমাকে খবর দেবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কি হতে পারে। আমরা সময় নষ্ট করি না। দ্রুত দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মত্ত হই। পার্থক্যের মধ্যে একটাই, আমি এবং আমান এক দলে হয়েছি। খুব শীঘ্রই আমাদের চিৎকার, চেঁচামেচিতে পাড়া মাত হয়ে গেলো।

সবদিন অবশ্য খেলা হয় না। মাঝে মাঝে আমি এবং আমান দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এদিক সেদিক ঘুরতে যাই। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হয়ে গেলো রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকা। প্রায়ই দেখা হয় স্থানীয় মানুষদের সাথে। তারা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে হাত নাড়ে, কথাবার্তা বলে। প্রতিদিনই যেন এক নতুন নতুন অভিযানের স্বাদ পাই। মাঝে মাঝে রুশীও তার পুতুল কোলে নিয়ে আমাদের সঙ্গী হয়। জোয়ানদের অনেকেই আমাদেরকে চেনে। তারা অনেক সময় গম্ভীর কণ্ঠে সাবধান কওে - বেশী দূর যাবে না খোকারা। সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরবে। এই নিয়মটা অবশ্য আমরা এমনিতেও মেনে চলি। প্রথমত দেরি করে ফিরলে মায়ের বকুনিতে জীবন শেষ হবে, বাবার প্রশ্রয়েও কাজ হবে না। দ্বিতীয়ত অন্ধকারকে আমাদের সবারই অল্প বিস্তর ভয়। বালসুলভ নিষ্পাপতার কারণে মানুষের ভয় বিশেষ একটা নেই কিন্তু মা সর্বক্ষণ তবুও সাবধান করেন।

এখানে কোন স্কুল নেই। পড়াশোনা যা করার বাসাতেই করতে হয়। বাবা-মা হঠাৎ করেই আমাকে ও রুশীকে পড়াশোনার ব্যাপারে চাপ দিতে শুরু করলেন। তাদের ভয় দেশে ফিরে গিয়ে দেখবো আমরা সমবয়েসীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছি। এই পর্যায়ে এসে আমাদের জীবনটা কিঞ্চিৎ জটিল হয়ে পড়লো। মা সবকিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি করেন, আমাদের পড়াশুনা নিয়েও এমন উঠেপড়ে লাগলেন যে আমাদের নাভিঃশ্বাস উঠে যাবার দশা। রুশী তো পড়তে বসলেই ঘুমে ঢুলতে থাকে। শুনলাম সবাই নাকি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে প্রবাসী বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল খোলার কথা চিন্তা ভাবনা করছে। বড় বাচ্চাদের বই-পত্র, শিক্ষক পাওয়া অসুবিধা হলেও আমাদের মতো অল্প বয়স্কদের জন্য খুব সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু নানান ঝামেলায় শীতকালে স্কুলের ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি হলো না। আমরা স্কুল নিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম। সাধারণত বিকেলের আগে বাসা থেকে বের হওয়া আমাদের সবার জন্যেই খানিকটা অসুবিধাজনক। বাবা-মায়েরা বকা দেন। এতো বাইরে বাইরে ঘোরা হচ্ছে কেন? স্কুল খুললে তখন দিনের বেলাতেও বাবা-মায়ের চোখের আড়ালে থাকা যাবে। পড়াশুনার ব্যাপারটা কারোরই তেমন পছন্দসই না হলেও অন্য সুবিধার কথা চিন্তা করে এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে সবাই রাজী।

ইতিমধ্যে বাবা সৈনিকদের মধ্যে জনৈক হাফেজের খোঁজ পেলেন। তিনি খুলনার মানুষ, বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়েস। কোরান শরীফ সম্পূর্ণ মুখস্থ। খুবই হাসি-খুশী মানুষ, সর্বক্ষণ পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে থাকেন। প্রথম আলাপে তাকে আমার ভালোই লাগলো। অন্য বয়েসী মৌলানাদের মতো ভাব-গম্ভীর নন। তার নাম মোহাম্মদ মেহের। আমরা তাকে মেহের ভাই বলেই ডাকতে শুরু করলাম। তিনি মাকে খালাম্মা ডেকে খুব সহজেই মায়ের মন জয় করে নিলেন। মেহের ভাইয়ের হাতে আমার ও রুশীর আরবী পড়ার হাতে খড়ি হলো। রুশী ছোট বলে ও আলিফ-বে-তে-ছে তেই অনেকদিন আটকে থাকলো। আমি আমপারা থেকে দ্রুত কোরান শরীফে চলে গেলাম। কিছু না বুঝলেও পড়াটা বেশ ভালোই রফ্‌ত্‌ করে ফেললাম। মেহের ভাই সুর করে পড়ানোর খুব চেষ্টা করলেন কিন্তু আমার সুর বেসুর নিয়ে বিশেষ চিন্তা ছিলো না। আমার প্রধান লক্ষ্য অন্তত একবার কোরান শেষ করা। সমবয়েসী অন্যান্য যারা এখনো আমপারাতে আটকিয়ে আছে তাদেরকে তাক লাগানো যাবে। বিশেষ করে বাশার ও রাতুলকেও মেহের ভাই আরবী শেখান। দু'জনই আমপারাতে আটকে আছে বেশ ক'দিন ধরে। মেহের ভাই বলল ওদের নাকি মনোযোগ কম। আমার অধিক মনোযোগ হবার কারণটা আমি আর তার কাছে খোলাসা করলাম না। মাঝে মাঝে আমার নিষ্ঠা দেখে তিনিও অবাক হয়ে যান। আমি একেক বৈঠকে প্রায় অর্ধেক পারা পড়ে ফেলি। মনে মনে হিসাব করি আর কতদিন লাগবে খতম করতে। বাবা-মা কথা দিয়েছেন আমি খতম দিলে তারা বাসায় মিলাদ দেবেন। চমৎকার প্রস্তাব। সবাই জানবে ভাবতেই আমার শরীরে শিহরণ জাগে।

দেশ থেকে খবর পেলাম সবাই ভালো আছে। স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম পত্র। দাদু নিজেই লিখেছেন। দেশের বাড়িতে দাদু, দাদী ও ঝিমা ভালো আছেন। আমরা থাকতে থাকতে যে ডাকাত পড়ছিলো তার পরে আর কোন অসুবিধা হয়নি। ডাকাত দলটা অবশ্য ধরা পড়েনি। নানার বাড়িতেও সবাই একরকম ভালোই আছে। আমার আগ্রহের কথা চিন্তা করে রানী আপার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। রানী আপার খুলনা যাওয়া হয়নি। যুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতার পর দেশের বাড়িতেই ছিলো সে। তার কোন অসুবিধা হয়নি। বশীর নামের বদমায়েশ ছেলেটা দাদুর ভাষায় মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখায় এবং কোন এক অপারেশনে মারা যায়। তার মৃত্যু সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায়নি, তার মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। বাস্তবিকই যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে কিনা তাতে দাদুর সন্দেহ আছে। চাচুরা সাতক্ষীরাতে ভালো আছেন। তাদেরও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। খুলনায় খালুদেরও কোন অসুবিধা হয়েছে বলে দাদুর জানা নেই।

আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বিশেষ করে আমি। বশীর মারা গেছে শুনে প্রাণে যেন বাতাস লাগলো। আল্লাহ যে তাকে ধরে খুব পাঙ্গা দিচ্ছেন সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। মেয়েদেরকে উত্যক্ত করার মজা বোঝো এবার। বাবা-মা শুকরিয়া আদায় করার জন্য কোরান খতমের ব্যবস্থা করলেন। মেহের ভাই সারাদিন ধরে আমাদের বাসায় বসে কোরান খতম দেবেন। মুখস্থ পড়বেন। ব্যাপারটা আমাদের বালক মহলে বেশ তোলপাড় তুলে

ফেললো। এতো মোটা একটি বই সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলাটা কি চাট্টিখানি কথা। আমাদের দশ লাইনের একটা কবিতা মুখস্থ করতেই জীবন বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা যখন কোরান খতম হলো, মা আমাদের সবাইকে ঘরে বানানো জিলাপি ও মিষ্টি দিলেন। মায়ের জিলাপি ভালো হলেও মিষ্টি প্রায়শঃই শক্ত হয়ে যায়। এইদিনও তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু সবাই দেখলাম সেগুলোই গপাগপ সেঁটে দিলো।

এভাবেই আমাদের শীতকালটা কেটে গেলো। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর গরম পড়ে তবে বাতাসে কিঞ্চিৎ আর্দ্রতা থাকায় ততখানি বোঝা যায় না। বহু ঝুট ঝামেলার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের স্কুলের একটা ব্যবস্থা হলো। অফিসার্স হাউজিং এর কাছাকাছি একটা একতালা বিল্ডিং এ আমাদের স্কুল শুরু হলো। প্রাথমিকভাবে তিনটি ক্লাশ খোলা হলো - টু, থ্রি, ফোর। যদিও আমি ইতিমধ্যে মায়ের ক্রমাগত গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্লাশ টু'য়ের পড়া সব বাসাতেই শেষ করে ফেলেছিলাম তবুও বয়েসের জন্য আমাকে টু'তেই ঢোকানো হলো। আমার সঙ্গী রাতুল। ক্লাশ টুতে আমরা দুইজনই। বাকি ছেলেরা যারা স্কুলে এলো অধিকাংশই আমাদের দুজনের চেয়ে বছর খানেকের বড়। তারা সবাই গেলো ক্লাশ থ্রিতে। ক্লাশ ফোরেরও খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্র। স্কুলে যাওয়া এটাই আমার প্রথম। রাতুলেরও। আমরা দু'জনই স্কুলে যাওয়াটা খুবই উপভোগ করতে লাগলাম। প্রায় প্রতিটি ক্লাশের পরেই অল্প কিছুক্ষণ বিরতি পাওয়া যায়। সবাই মাঠে চলে আসে। কিছুক্ষণ বল পেটানো হয়। শিক্ষিকারা ডাকলেই আবার এক দৌড়ে ক্লাশে ঢুকে যাই।

আমাদের শিক্ষিকা বয়েসে তরুনী। তার নাম ফারিনা। খুবই সুন্দরী, সবসময় সুন্দর করে সেজে থাকেন। কথা বলেন কোমল গলায়, হেসে হেসে। তিনি যখন কথা বলেন আমি ও রাতুল দু'জনাই হা করে শুনি। তার প্রিয় হবার জন্য আমরা দু'জন নীরবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। ক্লাশে কোন কাজ দিলে কে আগে শেষ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে। সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ সময়ে আমিই আগে শেষ করি। টিচার তার সুন্দর মুখখানাতে অপূর্ব এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে যখন বলেন - ভেরি গুড, খোকা। তখন আমার জীবন যেন সার্থক হয়ে যায়। আমি আড় চোখে রাতুলের দিকে তাকাই - কি, কেমন হলো? বেচারি মাঝে মাঝে মন খারাপ করে। ওতো আর জানে না মায়ের কাছে বকুনি খেতে খেতে এই সব ইংরেজি আর অংক আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রাতুলের শরীর খারাপ থাকলে সে যখন স্কুলে আসে না তখন আমাকে ক্লাশ থ্রিতে বসিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশেরই দেখলাম অংক বিদ্যা সামান্যই। আমার অংকে দক্ষতা দেখে তারা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে ক্লাশ থ্রিতে বসার কোন আগ্রহ নেই। আমি মিস্ ফারিনার কাছে পড়তে চাই। একাকীর চেয়ে রাতুল থাকলেই ভালো লাগে। এমন এক অসম্ভব সম্পদ আমরা দু'জনে সম্পূর্ণ নিজেদের করে পেয়েছি এই অনুভুতি দু'জনার মনেই দোলা দেয়। মিস্ ফারিনা বোধহয় আমাদের লাজুক মুখ আর খোঁচাখুচি দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে থাকবেন, কারণ তাকে প্রায়ই খিলখিল করে হাসতে দেখি। আমরা দু'জনাই কিঞ্চিৎ লজ্জায় পড়ে যাই।

দেখতে দেখতে সময় কেটে যেতে থাকে ফোর্ট সান্ডামানে। আমাদের ছোটদের জীবন বেশ খেলাধুলার মধ্যে কাটলেও বড়দের জীবনে তেমন বৈচিত্রময় কিছু ঘটে না। বাবা-মা দু'জনাই দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই বিদেশ বিভঁইয়ে আর কতদিন পড়ে থাকা যায়? যদিও বাবাকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হতে দেখতাম। বাংলাদেশের নতুন প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবর রহমান। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফেরেন তিনি। প্রথমে প্রেসিডেন্টের পদ নিলেও পরে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন, পরবর্তি নভেম্বর মাসের চার তারিখে বৃটিশ স্টাইলে ভারতীয় কনিস্টিটিউশনের মতো করে বাংলাদেশের নতুন কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয়। কিন্তু আমরা সেখানে বসেই যেটুকু খবর পাচ্ছিলাম তাতে মনে হচ্ছিলো যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি শান্ত হতে প্রচুর সময় লাগবে। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের পর অনেকেই নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করেননি। অনেকেই বাংলাদেশ আর্মিতে যোগদান করেন এবং দ্রুত ভালো পোষ্টে পৌঁছে যান। বাবার ও অন্যান্য বন্দী বাংলাদেশী আর্মি অফিসারদের ভয় ছিলো তারা দেশে ফিরে গেলে সমমর্যাদা পাবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধের সময়ে তারা আটকা পড়ে যান পাকিস্তানী ভুমিতে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ তাদের হয়নি। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের অনেক জুনিয়র অফিসারেরা হয়তো তাদেরকে নাস্তানাবুদ করবে। বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগলো দেশে ফেরার পর আর্মির চাকুরি হয়তো তিনি ছেড়েই দেবেন। কিন্তু দেশে ফেরার ব্যাপারটাও খুব সহজ মনে হচ্ছে না। পাকিস্তান ভারতের কাছ থেকে তাদের প্রচুর বন্দী সৈন্যদেরকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য আমাদের জিম্মি হিসাবে ব্যবহার করছে। বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়, বিশেষ করে তৃতীয় একটি দেশের সাথে। বাংলাদেশেও প্রচুর বিহারী রয়েছে, তাদেরও পাকিস্তানে আসার ইচ্ছা। সব মিলিয়ে বেশ জটিল একটা প্রসঙ্গ। রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন কিছুই দ্রুত হয় না। অগ্রগতি এমন ধীর যে কেউই খুব শীঘ্রই দেশে ফিরতে পারবে বলে ভরসা করছে না। মা আঙিনার সামান্য জায়গাতেই শাক-সব্জি লাগিয়ে ফেললেন। এই ব্যাপারে আমার ভয়াবহ আগ্রহ। আমিও তার সাথে হাত মেলাই। সময় পেলেই ঘাস বাছি, কিংবা একটু নিড়িয়ে দেই। মিল্কীর এক বছর হয়ে গেছে। সে এখন বেশ জোরেসোরে হামাগুড়ি দেয় মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এখুনিই আমাকে অনুসরণ করতে চায়। আমি বাইরে গেলে সেও বাইরে যাবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আমি বাগানে গেলে সেও হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে। বাধ্য হয়ে আমি তাকে কোলে নেই। নইলে তার যে কান্ডজ্ঞান, গাছগুলোর উপর দিয়েই যাত্রা শুরু করবে। তবে তাকে কোলে নিলেও সমস্যা আছে, শুধু বাইরে যেতে চাইবে। বাসার বাইরে নিয়ে গেলে সে মহাখুশী। আমাদের বাসার সামনে রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি চলে। সেই গাড়ি দেখে মিল্কীর আনন্দ আর ধরে না। সে গা-গা করে বহু কিছু বলে। আমানও দেখা গেলো বাচ্চা খুবই পছন্দ করে। মিল্কী তারও বেশ ভক্ত হয়ে গেছে। মূলত আমান তাকে নিয়ে রাস্তার পাশ ধরে হাঁটে বলেই আমানকে তার পছন্দ। আমানের অন্য কোন ভাই বোন নেই। বাসায় সম্ভবত তার একাকি লাগে। আজকাল তার মাকে বলে সে প্রায়শঃই আমাদের বাসায় চলে আসে। মা তাকে বেশ পছন্দ করেন। এই ছেলেটিই যে কয়েক দিন আগে আমার কপাল ফাটিয়েছিলো সেই ক্ষোভ

মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন। কয়েকদিন বাদে সে মেহের হুজুরের কাছে আমাদের সাথে জোট বেঁধে আরবীও পড়তে লাগলো। তবে তার অগ্রগতি দেখে মেহের হুজুর প্রায়ই দাঁত বের করে হাসেন - আমান, তুমি বাংলা পড় না আরবী পড়ো?

এই জাতীয় কথায় আমান মোটেই বিব্রত হয় না। মেহের হুজুরের প্রচুর ধৈর্য। তিনি আবার তাকে পড়াতে থাকেন। আমার অগ্রগতি অবশ্য মেহের হুজুরসহ বাবা-মায়েরও সন্দেহের উদ্রেক করে। আমার দ্রুত আরবী পড়ার ব্যাপারটা কারোরই পছন্দ হয় না। নিশ্চয় আমি ভালোভাবে উচ্চারণ করছি না। একটা পড়তে অন্য একটা পড়ছি, লাইন বাদ দিচ্ছি - এমনি নানান সন্দেহ। আমি অবশ্য অনড়। আমার উদ্দেশ্য অন্তত একবার খতম দেয়া। গ্রীষ্ম গিয়ে শীত চলে আসছে, অথচ আমার এখনো যথেষ্ট বাকি। এই বছরের মধ্যেই শেষ করার ইচ্ছা ছিলো। সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষাও এগিয়ে আসছে। শুনেছি যে প্রথম হবে তাকে বিশাল একটা উপহার দেয়া হবে স্কুল থেকে। রাতুলকে পরাজিত করা বিশেষ কষ্টকর হবে বলে মনে হয় না। আমি মনে মনে উপহারের আকার ও প্রকৃতি নিয়ে নানান ধরনের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকি।

এই পার্বত্য এলাকাতে ঠান্ডা যেন ঝপ করেই নামে। দেখতে দেখতে গরম কালটা কেটে গেলো। শীতের আমেজটা প্রথম দিকে ভালো লাগলেও প্রকোপটা যখন বাড়তে থাকে তখন কাঁপুনি শুরু হয়। বাইরের চেয়ে ভেতরেই সময় কাটে বেশী। এতো ঠান্ডার মধ্যে বাইরে থাকাওতো দুষ্কর। সকালে কাঁপতে কাঁপতে আমি আর আমান দল বেঁধে স্কুলে যাই। আমি টুতে গিয়ে ঢুকি, আমান থ্রিতে। মিস্ ফারিনা ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঠিকঠাক করছেন। আমাদের পরীক্ষার সিলেবাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। পরীক্ষা হবে দু'টি। ইংরেজি ও অংক। তার প্রশ্নপত্র সাধারণত সহজই হয়। তার হাত থেকে পুরষ্কার নেবার ব্যাপারটা এমন লোভনীয় মনে হলো যে প্রচুর পড়াশুনা করলাম। পরীক্ষার সময় একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসে পরীক্ষা দিলাম আমি আর রাতুল। মিস্ ফারিনা কখনও আমাদের সম্মুখে বসে থাকেন, কখনো বাইরে হাঁটতে চলে যান। ইংরেজি পরীক্ষা দু'জনারই একই রকম হলো। দু'জনাই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিলাম। ইংরেজি নিয়ে রাতুলের সমস্যা ছিলো না। ওর সমস্যা ছিলো অংকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো অংকে আমি সহজেই ওকে হারিয়ে দেবো। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পেয়ে আমার মুখে হাসি ফুটলো। খুবই সহজ প্রশ্ন। এমনকি রাতুলকেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখলাম। তবে শেষ পর্যায়ে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিপদে পড়লো ও। মিস ফারিনা বাইরে হাঁটতে যেতেই আমার সাহায্য চাইলো। বন্ধুকে সাহায্য না করবার কথা মনেও এলো না। টপাটপ বলে দিলাম কিভাবে কি করতে হবে। সর্বনাশ হলো। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারলাম। যখন রেজাল্ট বের হলো দেখা গেলো ইংরেজি পরীক্ষায় আমি ওর চেয়ে এক মার্ক কম পেয়েছি। অংকে দু'জন সমান পেয়েছি। রাতুল ফাষ্ট হলো, আমি সেকেন্ড। মিস্ ফারিনা যেদিন গাড়িতে করে বিশাল সাইজের একটা পুরষ্কার নিয়ে রাতুলের বাসায় এলেন আমি তখন নিকটেই খেলছিলাম। আমাকে দেখে তিনি হাত নাড়লেন। আমি শুকনা মুখে উল্টা হাত নাড়লাম। সমস্ত হৃদয়টা ব্যথায় চিনচিন করে উঠলো। রাতুলেরই জিত

হলো। অংক না দেখালেও চলতো। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলি। সামান্য একটা পুরষ্কারে কি আসে যায়। রাতুল আমার বন্ধু, প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করাটা আমার কর্তব্য। আমান আমার মনের অবস্থা ধরতে পারে। সে সমর্থন দেয়, তুমি ঠিকই করেছো, এইটা একটা ফালতু পুরষ্কার, চলো আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটি। আমি নিঃশব্দে আমানের সঙ্গী হই।

বাবা-মায়ের অবশ্য ব্যাপারটা মেনে নিতে আমার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট হলো। তাদের দু'জনার কারোরই কোন সন্দেহ নেই যে আমি প্রথম হয়েছিলাম। ইদানিং বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছিলো যে স্কুলের গভর্নিং বডিতে যারা আছেন তাদের ছেলেমেয়েরা নাকি কিছু বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো মিস্ ফারিনা ইচ্ছে করে আমাকে কম নম্বর দেবেন। ইংরেজিতে আমি রাতুলের চেয়ে ভালো বই খারাপ নই, তবুও হতে পারে এই বিশেষ পরীক্ষাতে আমি হয়তো মনের ভুলে কিছু একটা ভুল লিখেছি। রাতুলের বাবার গভর্নিং বডিতে থাকার সাথে আমার দ্বিতীয় হবার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা মাকে, বিশেষ করে মাকে কে বোঝাবে? সন্দেহ শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে দাঁড়ালো যে পরবর্তি বছরে আমার স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেলো। ঠিক হলো আমি বাসাতেই বাবা-মায়ের কাছে পড়বো। স্কুলের আনন্দময় পরিবেশ ছেড়ে বাসায় বসে পড়বার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু কি করা? বিকেল বেলায় অবশ্য বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। ইদানিং যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বাদ দিয়ে আমরা ফুটবল খেলা ধরেছি। একটা বলের পিছনে মরিয়া হয়ে ছোটাছুটি করার ভেতরে যে এতোখানি আনন্দ আছে ব্যাপারটা আগে টের পাইনি। আমার দক্ষতাও দ্রুত বেড়ে গেলো। দলে বিশেষ একটা স্থানও তৈরি হলো।

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ বিকট একটা শব্দ শুনে হকচকিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। বাবা-মায়েরও ঘুম ভেঙেছে। বাবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন কি হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাসার কোন জানালা দিয়ে রাস্তার পরিষ্কার দৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু গাড়ি স্কিড করবার শব্দ শুনেছিলাম আমরা। বাবা বললেন - বোধহয় কোন এক্সিডেন্ট হলো। তোমরা ঘুমাও। আমি দেখে আসি। আমি সঙ্গী হতে চাইলাম, কিন্তু মায়ের ধমক খেতে হলো। মন খারাপ করে আবার বিছানায় চলে গেলাম। ইচ্ছা ছিলো বাবা না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবো কিন্তু সারাদিনের ছুটাছুটির পর শরীর এখন ক্লান্ত থাকে। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম আবার, নিজেও টের পেলাম না। সকালে ঘুম ভাঙতেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে এক লাফে দরজার বাইরে। আমান আমার বাসার দিকেই আসছিলো। তার মুখেই শুনলাম আগের রাত্রে কমাণ্ডারের গাড়িতেই নাকি এক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা রাস্তার দিকে ছুটলাম। একটু খুঁজতেই ঘটনাস্থল পেয়ে গেলাম। গাড়ি ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু যে ল্যাম্প পোষ্টটিতে ধাক্কা দিয়েছিলো সেটার শরীরে স্পষ্ট দুর্ঘটনার চিহ্ন। পোষ্টটার শরীরে রক্তের চিহ্নও নজরে পড়লো। সেই মুহুর্তে আমান আমার সঙ্গী থাকায় ব্যাপারটার ভয়াবহতা সম্ভবত কিঞ্চিৎ কম মনে হলো কারণ ঐ দিন রাতে আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। খুবই রক্তারক্তি ব্যাপার। চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে বসতে উল্টা ধমক খেতে হলো মায়ের কাছে। –'গেছিলি এক্সিডেন্ট দেখতে?

আবার চেঁচাবি তো থাপ্পড় খাবি। কথা বললে কথা শুনবে না, এখন মাঝরাতে বাজে স্বপ্ন দেখে রাজ্যের মানুষের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে।'
কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকি। আমি প্রচুর উদ্ভট স্বপ্ন দেখে থাকলেও এসব ভীতিকর স্বপ্ন সাধারণত দেখি না। আবার কি নতুন আপদ শুরু হলো।

শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের দিকে আমি কোরান শরীফ প্রথমবারের মতো শেষ করলাম। বাবা-মায়ের আমার মানগত দিকে সন্দেহ থাকলেও এই উপলক্ষ্যে তারা মিলাদের ব্যবস্থা করলেন। মা তার বিখ্যাত জিলাপী ও শক্ত মিষ্টি বানিয়ে ফেললেন। বাবা বাজার থেকেও কিছু নিয়ে এলেন। মেহের হুজুর মন উজাড় করে দিয়ে মিলাদ পড়ালেন। ছেলেরা সবাই প্রায় এলো, যদিও তাদের বাবারা সবাই এলো না। আমাদের ছোটদের মধ্যে বিবাদ কমে যতই বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হচ্ছিলো, ততই লক্ষ্য করছিলাম বড়দের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে উঠছিলো। কার বাবা-মায়ের সাথে কার বাবা-মায়ের আলাপ নেই হিসেব রাখতে আমাদেরকে হিমসিম খেতে হচ্ছিলো। রৌশন ভাই ও রুশনী আপাও এলেন। কিন্তু আলতাফ আঙ্কেল ও নুরী আন্টি এলেন না। ভলিবল খেলায় মারপিট হবার পর আলতাফ আঙ্কেলের সাথে বাবার সম্পর্ক সেই যে শীতল হয়েছিলো, তা আর আদৌ ভালো হয়নি। রাতুল প্রথম হবার পর থেকে বজলুর আঙ্কেল ও সালেহা আন্টির সাথেও বাবা-মায়ের সম্পর্ক বেশী শীতল হয়ে পড়েছে ইদানিং। কিন্তু সেইসব নিয়ে আমি মোটেই উদ্বিগ্ন নই। মিলাদে আমার বন্ধুরা যে সবাই এলো তাতেই আমি খুশী। আমরা খুব চিৎকার করে করে 'ইয়া নবী ইয়া রসুল - সালাম আলাইকা' পড়লাম মেহের হুজুরের সাথে সাথে। বন্ধুরা যে আমার এই কৃতিত্বকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে ভেবে খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব করলাম। মেহের হুজুরও আমার এই কৃতিত্বে যারপরনাই আনন্দিত হয়ে আমাকে একটি টুপি কিনে দিলেন। বিপদ হলো একটা অবশ্য। বাবা-মা এবার আমাকে নামাজ পড়বার জন্য যন্ত্রণা করতে শুরু করলেন। বাবা মাঝে মাঝে জোর করে আমাকে তার সাথে নিয়ে দাঁড় করাতে লাগলেন। তাকে খুশী করবার জন্য আমি অজু করে প্রায়ই তার সাথে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য অবশ্য তেমন নিষ্পাপ নয়। মোনাজাতের সময় দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রচুর দোয়া করি নানান ধরনের খেলনা অথবা ছবির বইয়ের জন্য। লক্ষ্য করলাম আল্লাহ এতো মানুষের মধ্যে কেন যেন আমার দোয়া শুনলেন। তিনি বাবাকে দিয়ে আমার জন্য বেশ কয়েকটা ছবির গল্পের বই কিনিয়ে দিলেন। আমার গল্পের বই পড়ার সেখানেই বোধহয় শুরু। ইংরেজি গল্প, খুবই সহজ করে লেখা। পটাপট বইয়ের পর বই শেষ করতে লাগলাম। শীঘ্রই খেয়াল করলাম আল্লাহ আমার দোয়ায় আর বিশেষ একটা কান দিচ্ছেন না। আমার নামাজে আগ্রহও ধীরে ধীরে কমতে লাগলো।

---

সুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।